বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন : বঞ্চিত মানুষের জন্য আর্থিক সেবার সুযোগ সৃষ্টি

আতিউর রহমান*

১। অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) উন্নয়ন ভাবনা

সাম্প্রতিক সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) উন্নয়ন ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রচলিত উন্নয়ন চিন্তা কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। উন্নয়নের সুফল সমাজের সকল মানুষের মাঝে সুষম বণ্টন, সবার জন্যে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি, অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন ইত্যাদি নানা উন্নয়ন কৌশল এই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনার আওতায় পড়ে। তবে এই উন্নয়ন তত্ত্বের সার্বজনীন বা সর্বসম্মত সংজ্ঞার খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন দারিদ্র্য-বান্ধব (pro-poor) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হিসেবে। অন্য কথায়, বঞ্চিতদের জন্যে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কেবল আয়ের সুষম বণ্টনই নয়, বরং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃজন এবং বৈষম্য দূরীকরণকেও বোঝায়। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি উন্নয়নের মাধ্যমে এমন ধরনের প্রবৃদ্ধির কথা বলছে যেখানে ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হবে (World Bank 2009)। পক্ষান্তরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর মতে, এমন প্রক্রিয়াই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া যা সবার জন্যে সমান সুযোগ তৈরি করে (Rauniyar and Kanbur 2009)। অর্থাৎ যখন সমাজের সকলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এবং তার ফলাফলের সমান অংশীদার হয়। তবে যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষদের। পুরো প্রক্রিয়াটিকে এক সঙ্গে দেখলে দেখা যাবে এটা এমন একটা উন্নয়ন কৌশল যা উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

প্রহলাদ (২০১০) এবং ব্যানার্জি (২০১১) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের নানা সৃজনশীল উদ্যোগের কথা বর্ণনা করেছেন। গরিবের মাঝে অর্থ প্রবাহ করা গেলে তারাও যে সফল উদ্যোক্তা হতে পারেন এবং নিজেদের দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি কর্মসুযোগ সৃষ্টি করে অন্যের দারিদ্র্যও ঘোচাতে পারেন সে কথাটিও তাঁরা নানা উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, উন্নয়নের ছোঁয়া সবার জন্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি করে এবং মানবসম্পদের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এডিবি'র গবেষণাটিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বলতে মূলত কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুযোগ যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাসহ সামগ্রিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সবার সমান প্রবেশাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সকল নাগরিকের জন্যে সমানভাবে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ - এসবই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য।

* গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক। ই-মেইল : governor@bb.org.bd।

একবিংশ শতকের উন্নয়নের মূল শক্তি তথ্যপ্রযুক্তি (IT)। কেননা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ করে উন্নয়নশীল বিশ্ব তাদের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ড় কম খরচে এবং দ্র"ততম সময়ে দক্ষতার সাথে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ব্যাঙ্গালোরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে জনসেবার সাথে সংশিণ্টষ্টদের দুর্নীতির সুযোগ কমেছে; নিশ্চিত হয়েছে দক্ষতা ও জবাবদিহিতা; অর্জিত হয়েছে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; এবং সৃষ্টি হয়েছে সৃজনশীল আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ তর"ণ উদ্যোক্তা শ্রেণি। বিগত কয়েক দশকে ভারতের ধারাবাহিক উচ্চ হারের (প্রায় ৯ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে এই তর"ণ উদ্যোক্তা শ্রেণির অবদান অনস্বীকার্য। তথ্যপ্রযুক্তির যে অপার সম্ভাবনা তার শতভাগ সুযোগ ব্যবহার করে সমাজের সকলের অংশগ্রহণে অন্ড়র্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়েছে (Nilekani 2008)। সুযোগের সদ্ব্যবহার, সুযোগ গ্রহণে সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাজারভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সেখানকার অন্ড়র্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করেছে। বাংলাদেশেও হালে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার অন্ড়র্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারায় গতিময়তা এনেছে, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেকের কাছে অর্থ পৌঁছানোর কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনর্জাগরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র ও মোবাইল ব্যাংকিং এর সমন্বয়ে একেবারে নিচের দিকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির নানা উদ্যোগ এখন লক্ষ করা যাচ্ছে ।

অন্ড়র্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারনার মূল লক্ষ্যই হলো, উন্নয়নের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া গরিব মেহনতি মানুষের কাছে পৌঁছানো যাদের অবস্থান সমাজের একেবারে নিচ তলায় (Bottom of the Pyramid)। C.K. Prahalad & Stuart Hart (2002) ক্রয়ক্ষমতা বা Purchasing Power Parity (PPP)-এর ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্ব সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামোকে একটি পিরামিড এর সাথে তুলনা করে চারটি গ্র"পে ভাগ করেছেন। বিশ্বের ৭৫-১০০ মিলিয়ন জনসংখ্যা যাদের PPP ২০ হাজার ডলারের বেশি, তারা পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করছে। অপরদিকে পিরামিডের নিচতলায় অবস্থান করছে বিশ্বের প্রায় ৪ বিলিয়ন জনসংখ্যা যাদের PPP ১,৫০০ ডলারের কম। নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবায় প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাঁরা এই পরিস্থিতির শিকার।

সমাজের নিচু তলার এইসব মানুষদের অমিত সম্ভাবনার কথা প্রহলাদ লিখেছেন এভাবে, "Four billion poor can be the engine of the next round of global trade and prosperity. Serving the Bottom of the Pyramid consumers will demand innovations in technology, products and services, and business models. More important, it will require large firms to work collaboratively with civil society organizations and local governments. Market development at the Bottom of the Pyramid will also create millions of new enterpreneurs at the grass root level - from women working as distributors and enterpreneurs to village level micro enterprises (Prahalad 2010).

অর্থাৎ, এই সকল বঞ্চিত মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সৃষ্টি করে, তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে দ্র"ত মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সৃজনশীল পণ্য ও সেবা নিয়ে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার

বিভিন্ন দেশের নিচুতলায় অবস্থানকারী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে সেলুলার ফোন ব্যবহারের যে বিস্তৃতি বহুজাতিক মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আজ মোবাইল ফোন ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গতিময়তা এসেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব সমাজের নিচুতলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং সৃজনশীল উদ্যোগ সৃষ্টিসহ নানা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। উন্নয়নের এই গতিময়তা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর তাগিদও বৃদ্ধি করেছে।

ব্যক্তি অধিকারের প্রতি সচেতনতা, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ, সৃজনশীল উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি, প্রতিবেশগত ভারসাম্য, বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এসবই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চিন্তার কাঠামোগত দিক। সমাজের নিচুতলার বিশাল জনগোষ্ঠী যেমন একদিকে ভোক্তা, তেমনি অন্যদিকে উদ্যোক্তা। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের দারুণ এক ভারসাম্যের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। বিশ্বায়নের এই সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভিত্তিক এই সামাজিক রূপান্তর বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

বৃহত্তর ক্যানভাসে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যাত্রাপথে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বস্তুত এটি সামাজিকভাবে মানুষকে বাইরে রাখার বিপরীত ধারণা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি না ঘটার পেছনে যেসব কারণ কাজ করে সেসবের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য সম্পর্কিত নানা বঞ্চনা। যেমন: স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়া। এসব বঞ্চনার কারণে অনেকেই কাজের সুযোগ, আয় উপার্জন করার সুযোগ এবং ঋণ পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ বৈষম্যের কারণেও এ বঞ্চনার উদ্ভব হয়। তাছাড়া দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কারণেও সামাজিক সংঘবদ্ধতা ভেঙ্গে পড়ে এবং সেজন্যে আর্থিক ও সামাজিক বহির্ভূতকরণের উদ্ভব হয়। সেই অর্থে, উন্নত বা উন্নয়নশীল সকল দেশেই কোনো না কোনো ধরনের আর্থিক ও সামাজিক বহির্ভূতকরণ লক্ষ করা যায়। তবে দেশে দেশে তার মাত্রা ভিন্ন হতে বাধ্য। সে কারণেই এমনকি উন্নত দেশেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উন্নয়ন নীতিকাঠামোতে স্থান করে নেয়। তবে বাংলাদেশের মতো কম আয়ের দেশে দারিদ্র্য সম্পর্কিত বঞ্চনা ও বহির্ভূতকরণ আরও তীব্র। আর সে কারণেই তা দূর করার জন্যে নীতি উদ্যোগের খুবই প্রয়োজন এবং তা উন্নত দেশের চেয়ে আরও বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের প্রতিদিনের জীবন চলায় আমাদের মৌলিক কিছু লেনদেন সেবা প্রয়োজন হয়। যেমন আমানত গ্রহণ, চলতি খরচের জন্যে ঋণের দরকার মেটানো অথবা বিনিয়োগের জন্যে কার্যকর অর্থের দেয়া-নেয়া, হিসেব নিষ্পত্তি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানে এসব মৌলিক আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তি। নগরের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী ব্যক্তিরা ব্যাংক ছাড়াও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং পুঁজিবাজার থেকেও আর্থিক সেবা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা খুবই কম। বিশেষ করে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে একথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য। ছোট আকারের লেনদেন হয় বলে গরিব মানুষকে এসব সেবা দিতে প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহী হয় না। তাদের মতে, এসব সেবা দিলে তাদের যথেষ্ট লাভ হয় না। তাছাড়া গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষগুলোর সাক্ষরতার হার এখনো বেশ কম। সে কারণেও তাদের পক্ষে প্রচলিত

আর্থিক সেবা গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত। যারা গ্রাম থেকে নগরে এসে কাজ করেন তাদের আবার স্থায়ী ঠিকানা নেই। সে কারণেও তারা আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আর সে কারণেই সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ড় নিয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যাংকের প্রতিটি গ্রামে শাখা থাকতে হবে।

সত্তরের দশক থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটিয়ে ছোট ছোট ঋণ দিয়ে গরিবের আয় রোজগার বাড়ানোর নানা উদ্যোগ চোখে পড়ে। এর ফলে গরিবের আর্থিক অন্ড়র্ভুক্তির সুযোগ যে খানিকটা বেড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে একই সঙ্গে, দ্র"ত বেশি করে মুনাফা দেয়ার কথা বলে অনেক প্রতারণামূলক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে প্রসার লাভ করেছে। এমন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে অনেকেই সর্বশান্ড় হয়েছেন। এমন প্রতারণামূলক ঋণ কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য এবং সত্যিকারের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ভালোভাবে সততার সঙ্গে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকারবলে এই কর্তৃপক্ষের সভাপতি। সে কারণে এই কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বেড়েছে তেমনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধানও বেড়েছে। তা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার মাত্রাতিরিক্ত বলে ক্ষুদ্র ঋণকে ঘিরে জোর বিতর্ক রয়েছে। ফলে ক্ষুদ্রঋণ ধারণাটিই বর্তমানে বেশ খানিকটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তবে, অন্ড়র্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য যে আর্থিক সেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

মনে রাখতে হবে যে, ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা সম্প্রসারণ সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যার এক বড় অংশ এখনও আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত। প্রায় এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে; যাদের অনেকের জন্য বয়স ও অন্যান্য শারীরিক অক্ষমতার কারণে ক্ষুদ্রঋণের আওতায় আত্ম-কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। কেবল এই দরিদ্র অংশই নয়, ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের যে অংশটি সফলভাবে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে এসেছে এবং যে অংশটির এখন বৃহৎ ঋণের প্রয়োজন তারাও ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বৃহৎ ঋণ গ্রহণের শর্ত পূরণ করতে পারছে না। ফলে তারা একটি 'হারানো মধ্যবর্তী' (missing middle) শ্রেণিতে পরিণত হয়। কৃষি ও এসএমই এর মতো প্রবৃদ্ধি -সহায়ক অর্থনৈতিক কর্মকা"ে বাজার ব্যর্থতা (market failure) ও বাজার ব্যবধান (market gap) বিরাজমান, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এ কারণেই দ্র"ত ও অধিকতর অন্ড়র্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক অন্ড়র্ভুক্তির (financial inclusion) নীতি গ্রহণ করেছে।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ও অন্ড়র্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল

প্রথাগত কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কেবল মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও সুদের হারের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বা price stability নিশ্চিত করবে - এই চিন্ড়াধারায় পরিবর্তন এসেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দা পরবর্তী সময়ে সামগ্রিক আর্থিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতের সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহের সময়োপযোগী নীতি বান্ড়বায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকা রাখার বিষয়টি জোরেসোরে উচ্চারিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত চিন্ড়া কাঠামোর মধ্যে আঘাত হেনেছে। আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এর প্রথাগত সংকীর্ণ পরিসরকেন্দ্রিক এপ্রোচ আর্থিক খাতের

ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির ওপর সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব, রাজস্ব নীতির সাথে সমন্বয়ে জটিলতা, সর্বোপরি আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিগত স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও সংকটাপন্ন করে। তাই সময় এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এর বর্তমান কৌশলগত paradigm এ পরিবর্তন আনার (paradigm shift) এবং আর্থিক খাতের বহিস্থ (external) ও অভ্যন্তরীণ (domestic) বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখার।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল দায়িত্ব হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহের গতিধারা সুনিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২, সংশোধিত ২০০৩)। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির পাশাপাশি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশ-বান্ধব টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ঋণ স্কীম চালু করেছে। দেশের প্রত্যন্ত জনপদে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর জন্যে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফোন কোম্পানির মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক নতুন নতুন ব্যয়-সাশ্রয়ী (cost-effective) সৃজনশীল সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ব্যাংকগুলোর মানবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে সিএসআর (corporate social responsibility (CSR)) কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । সিএসআর কর্মসূচির মাধ্যমে মূলত ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ নানামাত্রিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকে সম্পদ প্রবাহ বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশ্বমন্দা পরবর্তী বিশ্বঅর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এ এই ধরনের উন্নয়ন চিন্তার সংযোজন সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

৪। বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা মূলত ব্যাংকের শাখা গ্রাম অঞ্চলে সম্প্রসারণ, সকল স্থানীয় ব্যাংককে জাতীয়করণ এবং সমবায়ভিত্তিক ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক তাদের সদস্যদের আমানত ও ঋণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন ক্ষমতাবানরাই এ সকল সুযোগ থেকে উপকৃত হয়েছে। দেশের গরিব মানুষ এ সকল সুযোগ থেকে উপকৃত হযেছে সামান্যই। ফলে অগণিত, অশিক্ষিত গরিব মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি। পরবর্তীতে বেশ কিছু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই অচলায়তন ভেঙ্গে আর্থিক সেবা দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। অবশ্য তাদের অনেকের কর্মসূচি মহিলাদের লক্ষ করে নেওয়া হয়েছে এই বিবেচনায় যে, পরিবারে মহিলারা আর্থিকভাবে শক্তিমান হলে প্রচলিত পুরুষ শাসিত পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন হবে এবং সন্তানদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় বিষয়ে মহিলাদের মতামত অগ্রাধিকার পাবে। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক সময়ে খুবই সীমিত আকারে গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য সহনীয় প্রিমিয়ামে মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স প্রবর্তন করেছে, যার আওতায় স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ও সম্পদহানির মতো ঝুঁকিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সালের এক জরিপে (CGAP's microfinance gateway; www.microfinancegateway.org) দেখা যায়, ১০টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ৬১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদার হয়ে ৮১টি ক্ষুদ্র বীমা পলিসি চালু করেছে। এ পর্যন্ড় ৪৫ লাখ গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় এগারো'শ কোটি টাকার মতো প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেছে।

অবশ্য দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের সফলতার বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণায় এবং সংবাদপত্রে অনেক সময় ঋণ গ্রহীতাদের ঝুঁকি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার চিত্র উঠে আসে, যা সংশোধনের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, আগেই বলা হয়েছে, ক্ষুদ্রঋণের কার্যকর সুদের হার নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের অপর একটি সমালোচনা হলো, এই ঋণের সুয়োগ অতি দরিদ্র বিশেষ করে যারা বয়স্ক অথবা অন্য কোনো কারণে আয়-উপার্জকারী কর্মকা" গ্রহণ করতে কিংবা এই ধরনের কোনো কর্মকা" নিয়োজিত হতে অক্ষম তারা পান না। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আর্থিক অন্ড়র্ভুক্তি ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার বাস্ড়বতা অস্বীকার করা যায় না। তবে যেসব সমালোচনা উঠেছে সেসবের দ্র"ত সুরাহা করতে না পারলে ক্ষুদ্রঋণের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বর্তমান সরকার অন্ড়র্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষি ও এসএমই খাতে মোট ঋণের পরিমাণ উলেণ্টখযোগ্য হারে বৃদ্ধিসহ (চলতি অর্থবছরে (২০১১-১২) কৃষি খাতে ১৩,৮০০ কোটি টাকা এবং এসএমই খাতে ৫৬,৯৪০ কোটি টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে যুগোপযোগী কৃষি ও এসএমই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুন:অর্থায়ন (রিফাইন্যান্স) কর্মসূচির পরিধিও বিস্ড়ৃত করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এসএমই খাতের সম্প্রসারণ ও তদারকির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পৃথক এসএমই বিভাগ খোলা হয়েছে। এসবের ইতিবাচক প্রভাব সমাজ ও অর্থনীতিতে এরই মধ্যে পড়তে শুর" করেছে। এসব উদ্যোগের ফলে ক্ষুদ্রঋণের সমালোচনাগুলোও অপসারিত হচ্ছে।

এই প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র বর্গাচাষীদের জন্যে ৫০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক গ্যারান্টি রেখে একটি অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২,৭০,৮০২ জন বর্গাচাষীকে প্রায় ৩০৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোও বর্গাচাষীদের আলাদাভাবে ঋণ দিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মসূচির ফলে অন্ড়র্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাস্ড়ব ভিত্তি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেশের গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁদের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখা খোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি নতুন শাখা শহরাঞ্চলে খুলতে হলে আরেকটি শাখা গ্রামাঞ্চলে খোলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সুখের কথা, বেসরকারি খাতের ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকই বর্তমানে গ্রামীণ শাখা খোলার জন্যে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

কৃষকদের জন্যে সরকারের দেয়া সার, বীজ, জ্বালানি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহায়তা সরাসরি কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্ড়রের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে ১০/- টাকায় কৃষক একাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৯৫ লক্ষাধিক কৃষক নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলেছে। তাছাড়া বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোকেও তাদের গ্রামীণ শাখায় কৃষক

একাউন্ট খোলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের এইসব একাউন্টে সরকারের দেওয়া ভর্তুকি ছাড়াও কৃষকদের প্রবাসী সন্তানদের প্রেরিত রেমিট্যান্সসহ নানাবিধ আর্থিক লেনদেন সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করেছে। একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৪টি ব্যাংক ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে 'স্কুল ব্যাংকিং স্কীম' চালু করেছে। 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি'র আওতাধীনে বেকার যুবক/যুব মহিলারা ৫০ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারছেন। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারাও ১০ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছেন। মানবিক ব্যাংকিং এর আওতায় প্রতিবন্ধীদের জন্যেও ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। আর্থিক সেবায় আধুনিক প্রযুক্তি

আর্থিক সেবা স্বল্প খরচে ও দ্রুত সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছাতে প্রযুক্তি নির্ভরতার বিকল্প নেই। দেশের দ্রুত বিকাশমান আর্থিক খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ নজর দিয়েছে। দেশের সর্বত্র বিস্তৃত মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং সেবায় আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই ই-কমার্স ও ই-ব্যাংকিং প্রবর্তন করেছে। এ পর্যন্ত ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকদের দিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে ই-পেমেন্ট সুইচ চালুর কাজ শুরু করেছে। মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের সর্বোত্তম ব্যবহার করে ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফোন কোম্পানির মধ্যে আইটি পণ্যাটফর্ম গড়ে সৃজনশীল ব্যয়-সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ নীতির আওতায় এই ধরনের উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বেগবান করবে। এই সব প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তনের কারণে গ্রামীণ জনপদে স্বল্প সময়ে ও সহজে প্রবাসীদের রেমিটেন্সের অর্থ পৌঁছানো, তহবিল স্থানান্তর ও বিল পরিশোধসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং লেনদেন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে হুন্ডিসহ অবৈধ অর্থের লেনদেন কমে এসেছে।

লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় নিকাশ (automated clearing) ব্যবস্থা 'স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর' (Automated Clearing House)-এর কার্যক্রম নভেম্বর ২০০৯ থেকে শুরু হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকগণ ঢাকা শহরে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে চেকের লেনদেন সম্পন্ন করতে পারছে। তাছাড়া জুলাই ২০১১ থেকে ঋণ তথ্য আদানপ্রদানের জন্যে অনলাইন প্রবেশাধিকারসহ সিআইবি (Credit Information Bureau(CIB)) কে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অনলাইনে ঋণ গ্রহীতার সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করে দ্রুত ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, যা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার সেবার মানোন্নয়নে প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলোর মধ্যে অনলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন, ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স পণ্যানিংসহ নানাবিধ প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৬। সৃজনশীল আর্থিক সেবা

দরিদ্র-বান্ধব ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্থিতিশীল আর্থিক খাত গড়ে তুলতে সৃজনশীল আর্থিক সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যাংকিং সেবায় মানবিক

ধারণার অন্তর্ভুক্তিকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সিএসআর (corporate social responsibility) কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে প্রতিবন্ধী, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্যে আর্থিক সাহায্য/সেবা সম্প্রসারণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বেসরকারি খাতের ব্যাংক এ ব্যাপারে কর্মসূচি চালু করেছে।

উন্নয়ন ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভাবী প্রজন্মের জন্যে একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। পরিবেশ-বান্ধব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগে পরিবেশ সংরক্ষরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক 'গ্রীন ব্যাংকিং' নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে ব্যাংকিং খাতে পরিবেশ সহনীয় বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালায় ব্যাংকগুলোকে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্যে পৃথক তহবিল গঠন, পেপারলেস ব্যাংকিং (ই-ব্যাংকিং) প্রবর্তন, গ্রীন ব্যাংকিং প্রডাক্ট উদ্ভাবন, ব্যাংকের গ্রীন শাখা স্থাপন (যেমন- সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সরবরাহ) এবং গ্রীন ঋণনীতিমালা প্রণয়নের জন্যে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে পরিবেশ-বান্ধব বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক 'গ্রীন ব্যাংকিং' কার্যক্রমের আওতায় সৌরশক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ বান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ঘাটতি মোকাবিলায় প্রথমবারের মতো ২০০ কোটি টাকার 'সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন পণ্ড্যান্ট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' নামে একটি ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। ইতোমধ্যে ১৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এই খাতে বিনিয়োগের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও ২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করেছে। অপরদিকে সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এগিয়ে এসেছে। এর ফলে একদিকে যেমন জাতীয় গ্রীডের ওপর বিদ্যুতের চাহিদার চাপ কমবে, অন্যদিকে সৌরশক্তি নির্ভর সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থিত পানি বা surface water ব্যবহৃত হয় বিধায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

পরিবেশ-বান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের অন্যতম 'বায়োগ্যাস' বাংলাদেশের মতো কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত। কারণ, কৃষির প্রধান উপখাত শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকরা বর্তমানে মৎস্য ও পশুপালন করছে । একটি বায়োডাইজেস্টার পণ্ড্যান্ট স্থাপন করে ৩/৪টি গাভী পালন করে একজন কৃষক উদ্যোক্তা দৈনিক ১২-১৫ লিটার দুধ, ১০০ কেজি জৈব সার ও ১৩৫ ঘন ফুট বায়োগ্যাস উৎপাদন করতে পারে। প্রাপ্ত এই ৩টি বাই-প্রোডাক্ট অর্থনীতিতে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন, উৎপাদিত দুধ জনগণের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারবে; রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে; এবং উৎপাদিত বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয় তথা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আশার কথা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুযোগ গ্রহণ করে একটি বেসরকারি খাতের ব্যাংক এরই মধ্যে মানিকগঞ্জে বায়োগ্যাস পণ্ড্যান্ট স্থাপনে বিনিয়োগ করেছে। ইতোমধ্যে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও বায়োগ্যাস পণ্ড্যান্ট স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তারা যোগাযোগ করছে।

৭। উপসংহার

মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এর একটি বহুমুখী ভূমিকার রোড-ম্যাপ প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবী। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রথাগত দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব বিবেচনায় নিতে হবে। কেননা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি কৌশলের 'চুইয়ে পড়া' প্রভাব (spillover effect) দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে। তাছাড়া 'চুইয়ে পড়া' প্রভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বেগবান করবে।

নি:সন্দেহে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে এ যাবত কালের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত সেবার আওতায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা এসেছে। তবে ঋণ সেবাসহ অন্যান্য আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার এখনও সীমিত রয়েছে। ছোট আকারের ঋণ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বেশি বিধায় সুদের হার/সার্ভিস চার্জ উচ্চ মাত্রায় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকের নেতৃত্বে স্মার্ট কার্ড/মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন ছোট আকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার খরচ কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে। যেহেতু দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যা মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, সেহেতু ঋণের ছাড়করণ ও আদায়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনবে এবং বর্তমানে বাদ পড়া ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ের সক্ষমতা বাড়াবে উৎপাদন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে। তাছাড়া আমানতবিহীন ঋণ প্রদানে যে ঝুঁকি রয়েছে তাও কমবে।

যুগোপযোগী উন্নত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি দারিদ্র্য মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে আর্থিক সেবায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ cost-saving কৌশল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ, যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবধানটা আরও কমে আসে।

এ কথা ঠিক যে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সবার জন্যে একবারেই নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন নয়। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট নানাবিধ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী প্রায়শ:ই দুর্ভোগের শিকার হয়। এমনকি দারিদ্র্যের সংজ্ঞাও একটি তুলনামূলক বিষয়। একটি সচ্ছল সমাজেও বিরাজমান অতিমাত্রার অসাম্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই এমনকি উন্নত অর্থনীতিতেও সামাজিক নীতি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।

তবে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আজ অনুধাবন করতে পেরেছে যে, আর্থিক সেবা এখন আর তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়। তবে আরও অনেকটা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো দরিদ্র-সহায়ক না করা গেলে দারিদ্র্য নিরসনে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তবুও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিতদের জন্যে কি করে ভরসার পরিবেশ তৈরি করা যায়; কি করে তাদের আয় রোজগার বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। কবি গুরুর ভাষায়,

"সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলি। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব

আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। .... এ জন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া।"

গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৪১০): *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

Banerjee, A.V. and Duflo, E. (2011): *Poor Economics: a Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, Noida: Random House Publishers.

Prahalad, C.K. (2010): *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*, NewJersey: Wharton School Publishing.

Prahalad, C. K. and Hart, S. (2002): "The Fortune at the Bottom of the Pyramid," *Strategy+Business*, Issue 26. www.strategy-business.com.

Rauniyar, Ganesh and Ravi Kanbur (2009): "Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature," *Occasional Paper* No.8, Independent Evaluation Department, Asian Development Bank, Manila.

Nilekani, N. (2008): *Imagining India Ideas for the New Century*, New Delhi: Penguin Books India.

World Bank (2009): What is Inclusive Growth? http://siteresources.worldbank.org www.microfinancegateway.org.